Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 130 - 139
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তরালে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির অজ্ঞাতবাস : ‘খেয়া’ কাব্যের সাংকেতিক ভুবন

শম্ভুনাথ কর্মকার
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ভাষা ভবন, বিশ্বভারতী
Email ID : skarmakar50sk@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Rabindranath Tagore, Politics, Nation, Culture, Kheya, Symbolic, Imagination, Economic manifesto, Spiritual.

Abstract
Literature can never become proper without country and society. As the complexity of politics and economics increases, the sanctity of national life becomes insignificant. In the background of this social isolation, Rabindranath's ‘Kheya’ shows signs of spiritualism. Judging from the context of the movement against the split of Bengal (Banga-Bhanga) and the Swadeshi movement, a fragmented political culture emerges in the early 20th century. From which we can guess what Rabindranath's foresight was in the constructive plan of the country. But the stormy winds of that time also brought signs of failure. Rabindranath did not make a single protest against the current situation, but showed his fair attitude in the poems of ‘Kheya’. The present article presents a chronological analysis of that period.

Discussion

মহাবিদ্রোহের পর থেকে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। উনিশ শতক জুড়ে অসংখ্য স্বদেশপ্রেমের কবিতা ও গান রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে কিছু পংক্তি বিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের মুখে মুখে ফিরত। বিশ শতকের গোড়াতেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এবং স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল সমগ্র বাংলা তথা ভারতের আত্মমগ্ন নগরে— পল্লীপ্রান্তরে। সৃষ্টিশীল মানুষের অন্তরাত্মা জেগে উঠল। শুধু গান কিংবা কবিতা লিখে প্রতিবাদ জানিয়ে ক্ষান্ত হলেন না, সশরীরে সেই প্রতিবাদী মিছিলে বলিষ্ঠ নাগরিক হিসাবে যোগদান করলেন। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একজন। জাতীয় সমস্যার সমাধানে তিনি ক্রমশ সুলভ হতে থাকলেন। দেশের মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ পেলেন পুনর্বার। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুবাদে তাঁর অভিজ্ঞতার পুঁজি বৃদ্ধি পেল নিশ্চয় কিন্তু জাতীয়তাবাদের বীভৎস রূপ তাঁকে তৎক্ষণাৎ বিচলিত করল। ফিরে এলেন মাটির টানে, আনন্দময় কর্মজীবনে— শান্তিনিকেতনে। গণসংযোগের বিচ্ছিন্নতা তিনি কখনোই চাননি। তা সত্ত্বেও চরমপন্থী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ তাঁকে স্থির থাকতে দেয়নি, আহত করেছিল বারবার। উত্তাপ, উত্তেজনা, আবেগ ও উন্মাদনায় তাঁর মন সায় দিতে পারেনি। উগ্র রাজনীতিবিদদের কাছে তাই হয়তো পরে ‘ভন্ড’ আখ্যা পেলেন। শান্তিনিকেতন থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লিখিত পত্রে তাঁর আশা-নিরাশার মানসিক দৈন্য প্রকাশিত —

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্ত্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইঁহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্ত্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে। বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"[১]

'নিভৃতে' শব্দটি 'অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে'র থেকে নিষ্কৃতির দ্যোতক। আশ্রমিক পরিমণ্ডলে নিজেকে মেলে ধরার সামান্য ইচ্ছাটুকু ধরা পড়েছে চিঠির এই অংশে। পরবর্তী অংশে স্বক্ষেত্রের বাইরে আপন পদচারণার অক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে তৎকালীন 'রণবীর' নেতাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সৎ পরামর্শ এবং শান্তিপূর্ণ পথে চলার নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র। সেটুকু উদ্ধৃত করছি—

> "আমি কোনো জন্মেই 'লীডার' বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাট মাত্র— যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাঁহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকর্য্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব— কিন্তু 'নেতা' হইবার দুরাশা আমার মনে নাই— যাঁহারা 'নেতা' বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।"[২]

'নেতা' শব্দটিকে উদ্ধৃতিসহ ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার কারণ নিজের প্রতি অভিমান নাকি তৎকালীন চরমপন্থী নেতাদের প্রতি বিদ্রূপ! আজও আমরা কথায় কথায় ব্যঙ্গার্থে নেতা শব্দটি প্রয়োগ করে থাকি। বহুখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের সমস্ত সমাজের প্রতিমাস্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।"[৩]

'নেতা' অর্থে তিনি কখনও সমাজপতি এবং দেশনায়ককেও বুঝিয়েছেন। 'সমূহ'-র অন্তর্গত 'দেশনায়ক' প্রবন্ধের বর্জিত অংশে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নেতা সম্পর্কে ঠিক কী ধারণা পোষণ করতেন—

> "অল্পকাল পূর্বে বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময় প্রথম যখন জোয়ার আসিয়াছিল তখন ছাত্রদের মুখে এবং চারি দিকে 'নেতা' 'নেতা' 'নেতা' রব উঠিয়াছিল। তখন এই নেতৃহীন দেশে অকস্মাৎ নেতা এতই অদ্ভুত সুলভ হইয়াছিল যে, আমাদের মতো সাহিত্যরসবিহ্বল অকর্মণ্য লোকেরও নেতা হইবার সাংঘাতিক ফাঁড়া নিতান্তই অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের তখন এমনি বিপদের দিন গেছে যে, 'আমি নেতা নই' বলিয়া গলায় চাদর দিলেও সেই তাহার গলার চাদরটা ধরিয়াই তাহাকে নেতার কাঠগড়ায় টানিয়া আনিবার নির্দয় চেষ্টা করা হইয়াছে।"[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'খেয়া' রচনার সময় স্বদেশী আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়া বিপর্যস্ত করে তুলেছিল রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবন ও ভাবজীবনের উর্বর ভূমিকে। একদিকে 'স্বদেশী সমাজ'-এ সমাজপতি নিয়োগের প্রস্তাব, অপরদিকে ১৩১৩ সালে ১৫ বৈশাখ পশুপতিনাথ বসুর সৌধপ্রাঙ্গণে আহূত মহাসভায় পঠিত 'দেশনায়ক'-এর অভিষেক প্রসঙ্গ একই ভাবনার পরিণতি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অধিনায়ক রূপে বরণ করে নেবার দেশীয় প্রস্তুতিতে তিনিই অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছিলেন। মনে প্রাণে আনন্দিত রবীন্দ্রনাথ শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখেছিলেন— (বর্তমানে যা বর্জিত)

> "একদিন যখন নেতাকে ডাকি নাই, কেবল বক্তৃতাসভায় সভাপতিকে খুঁজিয়াছিলাম, সেদিন গেছে; তার পরে একদিন যখন 'নেতা নেতা' করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম সেদিনও আজ নাই; অতএব আজ অপেক্ষাকৃত স্থিরচিত্তে আমাদের একজন দেশনায়ক বরণ করিয়া লইবার প্রস্তাব পুনর্বার সর্বসমক্ষে উত্থাপন করিবার সময় হইয়াছে বলিয়া অনুভব করিতেছি। এ সম্বন্ধে আজ কেবল যে আমাদের বোধশক্তি পরিষ্কার হইয়াছে তাহা নহে, আমাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং দেশের হৃদয় নানা আন্দোলনের ও নানা পরিভ্রমণের পরেও অবশেষে যাঁহাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে তাঁহার পরিচয় অদ্য যেন পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে।"[৫]

তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে রবীন্দ্রনাথের মতামত সাদরে গৃহীত হবার উপায় ছিল না। জাতীয় রাজনীতিতে তথা রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় যিনি বিশ্বমৈত্রীর কথা ঘোষণা করেন, শান্তির বীজ বপন করতে চান শাসক ও শোষিতের মানবজমিনে— সেই রবীন্দ্রনাথকে এত সহজে মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। বরং রবীন্দ্রনাথের কিছু পাওয়ার ছিল না বলে কিছু না হারিয়ে ফিরে এলেন স্বমহিমায়— আপন কর্মক্ষেত্রে।

ব্যর্থতা জীবনের অন্তিম মূল্যায়ন হতে পারে না, 'খেয়া' উৎসর্গ-কবিতাটি সে কথা জানিয়ে দেয়। জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে লেখা হলেও আক্ষরিক অর্থে কবিতাটিতে নিজের জীবনের সত্য স্বরূপের পরিচয় বিধৃত। 'খেয়া'য় সান্ধ্যলগ্নের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। লজ্জাবতী পাতার ভাঁজে যেসব প্রাণের কথা লুকিয়ে আছে বলে মনে হয়, তাও মহত্তর সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

'বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র যাহা
ক্ষুদ্র তাহা নয়,
সত্য যেথা কিছু আছে
বিশ্ব সেথা রয়'।

বৃহতের সঙ্গে মিলিত হবার বাসনা থেকেই ক্ষুদ্রের যাত্রা শুরু কেন্দ্র থেকে। অনিকেত জীবনের রহস্য কোনও বোঝাপড়ার অপেক্ষা না রেখেই চলমান বিশ্বের নিঃসঙ্গ পথিক হওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধে 'আমার ধর্ম'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সত্যের বিশ্বদর্শন সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "মানুষের প্রত্যেকের মধ্যে সত্যের একটি বিশ্বরূপ আছে, আবার সেইসঙ্গে তার একটি বিশেষ রূপ আছে। সেইটেই হচ্ছে তার বিশেষ ধর্ম। সেইখানেই সেই ব্যক্তি সংসারের বিচিত্রতা রক্ষা করছে। ...সাম্প্রদায়িক সাধারণ নাম গ্রহণ করে আমি যতই মনে করি-না কেন যে, আমি সম্প্রদায়ের সকলেরই সঙ্গে সমান ধর্মের, তবু আমার অন্তর্যামী জানেন মনুষ্যত্বের মূলে আমার ধর্মের একটি বিশিষ্টতা বিরাজ করছে। সেই বিশিষ্টতাতেই আমার অন্তর্যামীর বিশেষ আনন্দ।"[৬]

বিশেষ (particular) থেকে নির্বিশেষের (universal) দিকে যাত্রায় নিভৃত-সাধনার পরিচয় রেখেছেন কবি। মাটির টান অনুভব করেছেন শিরায়-শিরায়। সূনৃতকথনের ভঙ্গি তাঁর করায়ত্ত। উক্ত প্রবন্ধের অন্যত্র লিখেছেন—

> "সত্যের একটি সুষমা আছে— সেই সুষমা না থাকলে সত্য আপনাকে আপনি ধারণ করে রাখতে পারে না।"[৭]

'সুষমা' শব্দটি সত্যের সুশ্রীকতার পরিচায়ক। আবার সামঞ্জস্য বা ভারসাম্যের দ্যোতকও বটে।

স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার রবীন্দ্রমানসে দীর্ঘস্থায়ী না হলেও তাঁর সৃষ্টিকর্মে প্রভাব বিস্তার করেছিল। গণজাগরণের উন্মুক্ত বাতায়নে বসে দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কার ও সংস্কৃতির তীব্র দহন অনুভব করবার শক্তি হারাচ্ছিলেন যখন, 'খেয়া'র আবির্ভাব সেই সময়েই। কর্মী ও কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে নেপাল মজুমদার লিখেছেন—

> "অত্যধিক উত্তেজনার অবশ্যই একটা প্রতিক্রিয়া আছে, অবসাদ আছে— বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মত কবি ও শিল্পীর পক্ষে। তবুও কলিকাতার স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। শুধু তাহাই নহে, কলিকাতার আন্দোলনে তিনি অন্যতম পুরোধাস্বরূপ ছিলেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহার মনে একটি অবসাদ ও ক্লান্তি আসে। এই মানসিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'খেয়া'র অধিকাংশ কবিতা রচনা (১৩১২ আষাঢ়-১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ)।"[৮]

প্রথম কবিতা 'শেষ খেয়া'র মধ্যে ক্লান্তির সুর সংগুপ্ত হয়ে আছে। জোয়ারের নয়, ভাঁটার স্রোতে একটি-দুটি তরী ভেসে যাওয়ার চিত্রাঙ্কন কবিমনের অস্তগামী অবসাদের প্রতীক। আবার দিনশেষে প্রতীক্ষার অনন্ত নির্দেশ বহন করছে নতুন কাজের প্রেরণা, পল্লীভাবনার অভ্যন্তরীণ পটভূমি। মধ্যবর্তী অবস্থানে রেখে নিজেকে দেখার দর্শন— যাকে আত্মদর্শন বলতে পারি তা পূর্ণমাত্রায় অভিব্যক্ত।

'ঘরেই যারা যাবার তারা কখন গেছে ঘর পানে,
পারে যারা যাবার গেছে পারে;
ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে
সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তারে। ...
দিনের আলো যার ফুরালো, সাঁঝের আলো জ্বলল না,
সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়'।

পদ্মাতীরের জীবনযাপনে যে-অম্লান প্রসন্নতা ছিল তা 'খেয়া' পর্বে নেই। বাইরের উন্মাদনা তাঁকে স্পর্শ করতে পারলেও তাতে যোগ দিয়ে সমাজসংস্কারকের ভূমিকায় নিজেকে বসাতে চাননি কখনোই। অথচ প্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ যেন এই কয় বছর কবির কলম পরিত্যাগ করিয়া প্রচারক ও সমাজসংস্কারকের কলম গ্রহণ করিয়াছেন।"[৯]

কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি নেতা বা অধিনায়ক হবার নেশা তাঁর কোনোদিনই ছিল না। বাস্তব ও কল্পনালোকের সংঘর্ষ 'মানসী'তেও আছে। কিন্তু 'আদর্শ ও বাস্তবের' নিদারুণ সংঘর্ষ চলেছে 'খেয়া'র আদ্যন্ত। আলোচ্য কবিতা সম্পর্কে প্রমথনাথের বিশ্লেষণ অনুসরণযোগ্য –

> "আগেকার দিনে যাহাকে বাস্তব মনে হইয়াছিল তাহা অপসৃত, অথচ নূতনও কিছু গড়িয়া উঠিল না। কবি যেখানে পা রাখিতে যান দেখেন সেখানে শূন্যতা, যাহাকে ধরিতে যান দেখেন সেখানে আশ্রয় নাই। পুরাতন আশ্রয়ও যাহার গিয়াছে নূতন আশ্রয়ও যাহার গড়িয়া ওঠে নাই, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে'— খেয়া সেই হতভাগ্যের অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। এই দোটানা অভিজ্ঞতা একপ্রকার অনিশ্চয়তা, এক প্রকার অস্পষ্টতা— ইহা অন্ধকারের সমতুল। খেয়া কাব্যে অন্ধকার যে বহুস্থানে image-রূপে ব্যবহৃত তাহার মূল এইখানে।"[১০]

নিভৃতচারী সাধনা পর্বকে অন্ধকারময় ইমেজ দিয়ে বিশ্লেষণ করা অবশ্য আমাদের অভিপ্রেত নয়। 'খেয়া'র পঞ্চান্নটি কবিতার মধ্যে তেইশটি কবিতায় নিশীথ রাত্রির অন্ধকারের বর্ণনা থেকে প্রমথনাথ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন— যা ভ্রান্তিসূচক।

'শেষ খেয়া'র সঙ্গে তুলনীয় 'দিঘি' কবিতার নিম্মোক্ত পংক্তি।

'দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ওই পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
বাপের ঘরে চায়'।

সাধারণ ধর্মের সূক্ষ্ম সাদৃশ্যে এই অংশটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উপমেয় 'শেষ আলোটি' এবং উপমান 'বধূ' বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের তাৎপর্যে চিত্রায়িত। শ্যামাপদ চক্রবর্তী লিখেছেন—

> "প্রত্যাসন্ন আত্মীয়বিচ্ছেদের বেদনা দুটিকে পরস্পরের সদৃশ ক'রে বিম্বপ্রতিবিম্বভাবের সাধারণ ধর্ম্মে পরিণত করেছে। 'শেষ আলোটি'-র রক্তিম আভা এই সঙ্গে স্মরণীয়; বধূর 'নয়ন রাঙা' করার গতি হ'য়ে যাবে সহজেই। সুন্দর এই উদাহরণটি।"[১১]

একদিকে সৃষ্টির প্রেরণা, নিজ-নিকেতনে ফিরে যাবার প্রয়াস; অন্যদিকে স্বদেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের দুর্বার আকর্ষণ, ব্যর্থতার পরেও 'ধর্ম' রক্ষার্থে বন্ধনপ্রেমী হয়ে ওঠার অকৃত্রিম আদর্শ-নির্মাণ তাঁর সত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে চলেছিল প্রতিনিয়ত। বিলিতি জিনিস বয়কটের বিকল্প অনুসন্ধান এবং জাতীয় সংস্কৃতির ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় 'ভাই ভাই এক ঠাঁই'-এর আন্তরিক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপনে— সেই সময় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম পদক্ষেপ রূপে পরিগণিত। রবীন্দ্রনাথের তন্নিষ্ঠ পরিকল্পনার আদর্শকে সম্মান জানিয়ে নেপাল মজুমদার লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথ বয়কট-আন্দোলনকে নিছক বিদেশী পণ্য বয়কট হিসেবে, কিংবা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে 'চাপ দিবার নীতি' (pressure tactics) হিসেবে দেখেন নাই। প্রকৃত স্বাধীনতা-লাভ কিংবা ক্ষমতা-লাভের পূর্বেই ইংরেজ-শাসনের অভ্যন্তরেই স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী পরিচালনায় শিক্ষা, স্বদেশী শিল্প, স্বদেশী অর্থনীতি ও স্বদেশী সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা।"[১২]

এবং অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের এই 'স্বদেশী সমাজ' নিছক একটা কাল্পনিক বা 'কল্পস্বর্গ' মাত্র (utopian) ছিল না। অথচ এই 'স্বদেশী সমাজ' পরিকল্পনাকে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।"[১৩]

অসফল রবীন্দ্রনাথের অনুশোচনার জায়গা ছিল না। পিছন ফিরে তিনি তাকাননি ঠিকই তবে না-পারার অন্তর্লীন বেদনার কাব্যরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'দিঘি'তে জীবচৈতন্য এবং বিশ্বচৈতন্যের পারস্পরিক প্রকাশ— অনুপম। অগভীর স্তর থেকে গভীর স্তরে অবগাহনের রূপক 'দিঘি'। সমস্ত আবেগ, উত্তেজনা, জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি নয়, মুক্তির সন্ধানে দিঘির জলে নির্মল নিমজ্জন। জগদীশ ভট্টাচার্যের মতে—

> "আত্মনিমগ্নতায়— দিঘির রূপকে অতল জলের গভীরে ডুবে যাওয়াতেই— কবির মুক্তি।"[১৪]

শান্তিনিকেতনের ছায়াবৃত পরিসরে এই কবিতা লেখার ইঙ্গিতটুকু নিবিড়। যে কারণে জগদীশের এরূপ মন্তব্য –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কবিতায় দিঘি হয়ে উঠেছে 'প্রাণের নিকেতনে'র দর্পণ। সেই প্রাণের নিকেতনে আছে ধুলার ধরার কাজের রঙ্গভূমি। কবিমানসের আত্মার অতল-গভীরতার নিস্তরঙ্গ দিঘিজলের দর্পণেই তার স্বরূপ ফুটে ওঠে।"[১৫]

ধ্বনিকাব্য তথা বস্তুধ্বনির[১৬] বিশুদ্ধ লক্ষণ এই কবিতায় আছে, যাকে আমরা ক্রমান্বয়ী চেতনার রূপায়ণ হিসাবেও চিহ্নিত করতে পারি। এই দিকটির প্রতি লক্ষ রেখেই জগদীশ ভট্টাচার্য 'কবিমানসী'র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন—

> "সিসৃক্ষু কবিমানসের আত্মার অতল গভীরতারই উপমান এই দিঘি।"[১৭]

আমাদের মতে রবীন্দ্র-কবিমানস যেমন বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে সদাউৎসুক এবং সিসৃক্ষু তেমন নিত্য-নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে শিশিক্ষুও বটে। দ্বৈত 'আমি'র আধ্যাত্মিক পরিসরে রেখেও এই দুই অভিব্যক্ত সত্তাকে বিচার করা যায়। যেমনটি করেছেন জগদীশ—

> "দিঘি কবিতায় আছে দুই- 'আমি'র কথা। অর্থাৎ দিঘিতে মানবত্বের কাছে নিজত্বের নিঃশেষ আত্মনিবেদন, তারই ফলে ঘটেছে পরিপূর্ণ বন্ধনমোচন।"[১৮]

'শান্তিনিকেতন' বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত 'পরিণয়' প্রবন্ধে দাম্পত্যজীবনের আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তা 'খেয়া'র 'বালিকা বধূ' কবিতার উপজীব্য। প্রথমে কবিতার সপ্তম স্তবকটি উদ্ধৃত করছি –

'তুমি বুঝিয়াছ মনে
একদিন এর খেলা ঘুচে যাবে
ওই তব শ্রীচরণে।
সাজিয়া যতনে তোমারি লাগিয়া
বাতায়নতলে রহিবে জাগিয়া,
শতযুগ করি মানিবে তখন ক্ষণেক অদর্শনে,
তুমি বুঝিয়াছ মনে'।

তুলনীয় বিদ্যাপতির পদ— 'সজল নয়ন করি/ পিয়া পথ হেরি হেরি/ তিল এক হয়ে জুগ চারি।' ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ-এর সুপরিচিত বিবাহবিষয়ক মন্ত্রটির (১।৩।৯) ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ পরব্রহ্মের তত্ত্বতালাশে মনোনিবেশ করেছেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—

> "পরমাত্মা আমাদের আত্মাকে বরণ করে নিয়েছেন— তাঁর সঙ্গে এর পরিণয় একেবারে সমাধা হয়ে গেছে। তার আর কোনো কিছু বাকি নেই, কেননা তিনি একে স্বয়ং বরণ করেছেন। কোন্ অনাদিকালে সেই পরিণয়ের মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। বলা হয়ে গেছে— যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। এর মধ্যে আর ক্রমাভিব্যক্তির পৌরহিত্য নেই। তিনি 'অস্য' 'এষঃ' হয়ে আছেন।"[১৯]

পরমাত্মা (বর) ও জীবাত্মার (বধূ) লীলায় মানবজীবন পূর্ণতা-প্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। সমালোচকের মতে—

> "কবির দৃষ্টিতে পরমসত্তা এই ভাবেই জীবসত্তাকে তার অগোচরেই অসীম স্নেহে আপন বলে গ্রহণ করেছেন।"[২০]

আশ্চর্যের বিষয় অন্যত্র। 'খেয়া'র এই কবিতা রচনার তিন মাস আগে 'রাজা প্রজা'র 'ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের মদমত্ত দম্ভ ও উল্লাসের উদ্দেশে কটাক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
OPEN ACCESS *A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ইংলন্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে, 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'; কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয় — পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।"[২১]

যদিও এই মন্তব্যকে সমালোচকের মনে হয়েছে—

> "ইংরেজের কপট আন্তরিকতার প্রতি কটাক্ষ"।[২২]

তবে 'খেয়া'র পটপরিবর্তন নিয়ে একটি সমস্যার জট তৈরি হয়েছে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সময় থেকে। পরবর্তীতেও তার সহজ সমাধানের ইশারা আমরা অন্তত পাইনি। রবীন্দ্র জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য যখন সকলের সামনে 'পাত পেড়ে' উপস্থাপিত তখনও সমালোচকদের রুচির সিদ্ধান্ত টলমলে। স্বয়ং রবিজীবনীকারের অবস্থাই শোচনীয়, সেখানে অন্যদের কাছে তা কীভাবে সুপাচ্য হবে! প্রথমে প্রশান্তকুমার পালের বক্তব্যে আসা যাক। পূর্বোদ্ধৃত প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যের খণ্ডন করতেই যেন তিনি লিখেছেন—

> "রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে বাস্তব ও কল্পনা কোথাও কোথাও সমসূত্রে বিধৃত হলেও বাস্তব ঘটনা দিয়ে তাঁর কবিতার ভাবকে ব্যাখ্যা করা বিভ্রান্তিজনক হতে পারে। এমনও দেখা গেছে, বাস্তব ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোনো কবিতার সূত্রপাত হলেও পরক্ষণেই কল্পনার অনুরঞ্জনে বা গভীর ভাবদৃষ্টির আবির্ভাবে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনকে অনুসরণ করা কঠিন, বহুবর্ণরঞ্জিত ও অসংখ্য মহলে বিভক্ত সেই কাব্যলোকের গোলকধাঁধায় ক্রমবিকাশ ও পরিণতির পথটি চিহ্নিত করা দুরূহ। এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে খেয়া-র কবিতাগুচ্ছ থেকে। মানসী, সোনার তরী, চিত্রা-য় সমস্যা নেই সেকথা আমরা বলছি না, কিন্তু সেখানে মানব ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁর মন সমভাবে বিভক্ত হওয়ায় গূঢ়সঞ্চারী কল্পনাকেও বুঝে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কিছু খেয়া থেকে তাঁর কবিতাবলী এমন একধরনের অধ্যাত্মচেতনার রূপকে নিজেদের আবৃত করেছে যে নিছক কাব্যরসবোধ দিয়ে তাদের অবগুণ্ঠন মোচন করা দুঃসাধ্য। বিশেষত সমকালীন কর্মজীবন ও ভাবজীবনের মধ্যে ব্যবধান এত বেশি যে পারাপার করা দুরূহ।"[২৩]

অন্যত্র 'খেয়া'র 'বিদায়' ও 'পথের শেষ' কবিতা-দুটিতে যাঁরা দেশের টালমাটাল অবস্থায় তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের কাছে উপেক্ষিত রবীন্দ্রনাথের সরে আসার মনোভাব লক্ষ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধ যুক্তি হিসাবে প্রশান্তকুমার লিখেছেন—

> "জাতীয় শিক্ষান্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিলেও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটিতে তিনি নিজেকে বিশেষ জড়িত করেননি। জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে যে উচ্ছ্বাস প্রবণতা ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ সেটি পছন্দ না করলেও এই আন্দোলন থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিযুক্ত করেননি। আসলে স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুর পর থেকেই তিনি সংসারের বিচিত্র কর্মজাল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে আসছিলেন। এর সঙ্গে মিশেছিল ঈশ্বরমুখীন একধরনের আধ্যাত্মিকতা। খেয়া-র কবিতাগুলিতে লিরিকের সঙ্গে এই আধ্যাত্মিকতার মিশ্রণ ঘটেছে।"[২৪]

অপরদিকে 'শুভক্ষণ' কবিতার ধ্বনিমুখ বিশ্লেষণ করে জগদীশ ভট্টাচার্য যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা তাঁর পূর্ববর্তী 'কবিতার আলোচনাকে কোনও অংশে নিষ্ফল এবং অম্লান করে দিয়েছে। 'খেয়া'য় 'শুভক্ষণ' আগে, 'দিঘি' পরে স্থাপিত হয়েছে। কালানুক্রমিক বিন্যাসটি যথার্থই। 'শুভক্ষণ'-এর রচনাকাল ১৩১২-র ১৩ শ্রাবণ এবং 'দিঘি'র রচনাকাল ১৩১৩-র ২৭ বৈশাখ। সেই অনুসারে জগদীশের আলোচনার পর্যায় অক্ষুণ্ন থাকেনি। এবং এই অব্যাহত না থাকার ফলে তিনিও

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অযৌক্তিক সিদ্ধান্তের ফাঁকি থেকে অব্যাহতি পাননি। অন্তত আমাদের কাছে। 'দিঘি'র মতো 'শুভক্ষণ'কেও ধ্বনিকাব্য হিসাবে বিচার করে তিনি এর পৌর্বাপর্যের মূলসূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছেন—

> "আসলে ধ্বনিকাব্য হিসাবে 'শুভক্ষণ' অনবদ্য। বাচ্যার্থে আছে কুমারী-হৃদয়ের সুকুমার অনুরাগ, ব্যাঙ্গ্যার্থে ফুটে উঠেছে স্বদেশের প্রতি কবির পরম অনুরক্তি।"[২৫]

ব্যাখ্যা যথাযথ এবং মনঃপূতও বটে। কিন্তু মুদ্রণ প্রমাদ হোক বা সমালোচকের অসাবধানতাবশত হোক, 'ব্যঙ্গ্য' হয়েছে 'ব্যাঙ্গ্য'। এরপরেই তিনি উপনীত হয়েছেন ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে। সেখানে তাঁর মন্তব্য—

> "ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যাবে, 'খেয়া'র রূপকাশ্রিত কবিতাগুলিতে কবির ভগবৎচেতনা নয়, স্বদেশচেতনাই মুখ্য।"[২৬]

কারণ—

> "বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটেই খেয়ার কবিতাগুলি বিরচিত।"[২৭]

তাই যদি শেষ কথা হবে, তবে শেষ কথাটি বলবে কে? এখানেই তো জগদীশ-আলোচিত 'দিঘি'র রূপক নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে। আর তা হলেই রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত ব্যাখ্যা ভুল পথে পরিচালিত হতে বাধ্য। যদিও সেই ব্যাখ্যায় 'শুভক্ষণ' বা 'দিঘি'র উল্লেখ নেই কিন্তু 'খেয়া'র মর্মকথা ধরা আছে সেখানেই। তা ছাড়া 'ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ' করতে গিয়ে সমালোচকের এ কথা স্মরণে রাখা উচিত ছিল যে ইতিহাস, কালের কথা বলে এবং কালানুসারী কথা বলে। সেজায়গায় সতর্ক এবং সজাগ থাকা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

এবার আসি 'আত্মপরিচয়'-এর তৃতীয় প্রবন্ধে। 'আগমন' এবং 'দান' কবিতা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "এমন অনেক গান উদ্ধৃত করা যেতে পারে যাতে বিরাটের সেই অশান্তির সুর লেগেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথা মানতেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না— তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়। তাই তো মানুষ তাঁকে ডাকছে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্— রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তার দ্বারা আমাকে রক্ষা করো। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার করে যে শান্তি, সে তো স্বপ্ন, সে সত্য নয়।"[২৮]

যেগুলিকে আমরা রূপক-সাংকেতিক নাটক বলে চিহ্নিত করে আসছি, 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত সেই সব নাটকের 'ভিতরকার ধুয়োটা'কে চিনিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ব্যাখ্যাকে করে তুলেছেন অনবদ্য—

> "যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়। এই জন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে— ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়।"[২৯]

স্ত্রী-কন্যার মৃত্যুশোকে ব্যথিত রবীন্দ্রনাথ কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন— প্রশান্তকুমারের নিছক অনুমান ছাড়া এ আর কিছুই নয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 130 - 139
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অধ্যাত্মচেতনার উন্মুক্ত পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ খুব সহজেই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। মনোরঙ্গভূমিতে সেই জ্যোতির্ময় দিব্যভাবের উদয় হয়েছে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর। 'খেয়া'র মধ্যে আমরা তাই প্রত্যক্ষ করি সাংকেতিক বিশ্বরূপ। প্রমথনাথ যাকে বাস্তবের বিকল্পরূপে দেখতে চেয়েছেন—

> "বাস্তবের বদলে গঠিত বাস্তবের বিকল্প সাহিত্যে symbol বা symbolism নামে পরিচিত। আসল যখন হস্তচ্যুত তখন তৎস্থলে নূতন একটা কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মানুষ কোনো রকমে কাজ চালাইয়া লয়; যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে পারে না তাহার শেষ আশ্রয় দাঁড়ায় নাস্তিক্য। খেয়া কাব্যে 'ঘরেও নহে পারেও নহে' অবস্থায় কবির মনে তখনও অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা, পুরাতনের আশ্রয়চ্যুত শিথিল মুষ্টিতে তখন নূতন কিছুকে আশ্রয় করিবার দুর্জয় সংকল্প।"[৩০]

নতুন সৃষ্টি বা সৃষ্টির নতুনত্বে রবীন্দ্রনাথের বরাবর আস্থা ছিল; পরমের প্রেরণায় তাঁর 'বাহির ও অন্তর' বিশ্বাসের আস্তিক্যে পরিপূর্ণ। অন্যত্র প্রমথনাথের বক্তব্য—

> "...আদর্শ ও বাস্তবের ঠিকে মিলিতেছে না বলিয়া কবিসত্তার গভীরে একটা ভাঙাগড়া চলিতেছে, সেই সাময়িক অরাজকতার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের আশায় কবি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্থলে জগতের স্বরূপ আবিষ্কার-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত। কিন্তু কাজটা সহজসাধ্য নয়, যতদিন স্বরূপ আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন symbol ব্যবহার করিয়া কাজ চালানো ছাড়া আর উপায় কি। এ যেন পুরাতন ইমারত ভাঙিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে নূতন গড়িবার সময়ে কাঠ ও বাঁশের ভারা বা ফ্রেম ব্যবহারের মতো। এখন, এই ভারাটাতে কোনো রকমে ঠেকা কাজ চলিয়া যায় বটে কিন্তু স্থায়িত্ব বা স্থায়িত্বের গৌরব কখনো তাহা পায় না। সাহিত্যে symbol তথা symbolism-এর তদ্রূপ অবস্থা। symbolism অসময়ের সহায়, চিরকালের নির্ভর নয়।"[৩১]

আমাদের আপত্তি এখানেই যে, symbolism যদি 'অসময়ের সহায়' হয়, তাহলে তাকে আশ্রয় করে লেখা কবিতাও সেরকম ঠুনকো হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা তো হয়নি। 'খেয়া'র পটভূমিই যেখানে জাতীয় রাজনীতির সাংস্কৃতিক সত্যকে উদ্ধারের প্রকল্পরূপে বহুল চর্চিত সেখানে সাংকেতিকতার বিশ্লেষণ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ 'খেয়া'ই সেই অন্যতম দলিল যা কবির অধ্যাত্মজীবনের অজ্ঞাতবাস পর্বকে সুনিশ্চিত দ্যোতনার সুরম্য ভবন থেকে নৈসর্গিক ভুবনে নিয়ে যাবার দিশা দেখায়।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'চিঠিপত্র', বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পঞ্চদশ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪০২, পৃ. ৪১-৪২
২. তদেব, পৃ. ৪২
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'স্বদেশী সমাজ', রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, দ্বিতীয় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ ও সংস্করণ, আশ্বিন ১৪২২, পৃ. ৬৩৪
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গ্রন্থপরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পঞ্চম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩, পৃ. ৮২০ (অতঃপর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড' নামে উল্লিখিত।)
৫. তদেব, পৃ. ৮২০
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'আত্মপরিচয়', রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, চতুর্দশ খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪২১, পৃ. ১৫২-১৫৩ (অতঃপর 'রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড' নামে উল্লিখিত।)
৭. তদেব, পৃ. ১৫৫

৮. মজুমদার, নেপাল, ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, অগস্ট ২০১১, পৃ. ২৭২ (অতঃপর ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' নামে উল্লিখিত।)

৯. বিশী, প্রমথনাথ, ‘রবীন্দ্র-সরণী’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, সপ্তম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ, ১৪১৫, পৃ. ১১৫ (অতঃপর ‘রবীন্দ্র-সরণী' নামে উল্লিখিত।)

১০. তদেব, পৃ. ১১৮-১১৯

১১. চক্রবর্তী, শ্যামাপদ, ‘অলঙ্কার-চন্দ্রিকা’, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ, ৮ সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৩, পৃ. ৬০

১২. ‘ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ’, পৃ. ২৭২

১৩. তদেব, পৃ. ২৭২

১৪. ভট্টাচার্য, জগদীশ, ‘রবীন্দ্রকবিতাশতক’, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, পুনর্মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ২৭৪ (অতঃপর ‘রবীন্দ্রকবিতাশতক' নামে উল্লিখিত।)

১৫. তদেব, পৃ. ২৭৪

১৬. কর্মকার, শম্ভুনাথ, ‘রবীন্দ্রকবিতায় বস্তুধ্বনি’, অচিনপাখি প্রকাশন, কাঁদোয়া, কৃষ্ণনগর, নদিয়া, প্রথম প্রকাশ, ২৩ ডিসেম্বর ২০২০, পৃ. ৩৮

১৭. ভট্টাচার্য, জগদীশ, ‘কবিমানসী’, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড : কাব্যভাষ্য, পুনর্মুদ্রণ, অগস্ট ২০১৮, পৃ. ১৪৮

১৮. ‘রবীন্দ্রকবিতাশতক’, পৃ. ২৭৪

১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পরিণয়’, ‘শান্তিনিকেতন ১-১০’, রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, সপ্তম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪২২, পৃ. ৬১১

২০. মজুমদার, পম্পা, ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস’, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ৬৭ (অতঃপর ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস' নামে উল্লিখিত।)

২১. রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৬৫৬

২২. ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস', পৃ. ৬৬

২৩. পাল, প্রশান্তকুমার, ‘রবিজীবনী’, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৯, পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পৌষ ১৪২১, পৃ. ২৫৪

২৪. তদেব, পৃ. ২৯১

২৫. ‘রবীন্দ্রকবিতাশতক’, পৃ. ২৮২

২৬. তদেব, পৃ. ২৮৫

২৭. তদেব, পৃ. ২৮৫

২৮. রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ১৬৪

২৯. তদেব, পৃ. ১৬৪

৩০. ‘রবীন্দ্র-সরণী’, পৃ. ১১৯

৩১. তদেব, পৃ. ১২২-১২৩